(১) বঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যঃ-

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

(ক) শব্দমধ্যে অবস্থিত 'ই' বা 'উ' তার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের পূর্বে সরে আসে। এই প্রক্রিয়াকে বলে অপিনিহিতি। বঙ্গালী উপভাষায় এই অপিনিহিতির ফলে সরে-আসা স্বরধ্বনি রক্ষিত আছে। যেমন— আজি > আইজ (আ+জ্+ই > আ+ই+জ্), করিয়া > কইর‍্যা ইত্যাদি। এছাড়া য-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জন, 'জ্ঞ' ও 'ক্ষ'-এর আগে একটি ইকারের আগম হয়। যেমন—বাক্য > বাইক্য, যজ্ঞ > যইগ্গ, রাক্ষস > রাইক্‌খস্ ইত্যাদি।

(খ) নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির (ঙ্, ন্, ম্ ইত্যাদির) লোপ হয় না, ফলে এই রকম লোপের প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির নাসিক্যীভবনের প্রক্রিয়া

বঙ্গালীতে দেখা যায় না। যেমন—চন্দ্র > চান্দ (এখানে নাসিক্য ব্যঞ্জন 'ন্' রক্ষিত আছে)।

(গ) উচ্চমধ্য অর্ধসংবৃত সম্মুখ স্বরধ্বনি 'এ' বঙ্গালীতে নিম্নমধ্য অর্ধবিবৃত সম্মুখ স্বরধ্বনি 'অ্যা'-রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—দেশ > দ্যাশ্।

(ঘ) উচ্চমধ্য অর্ধসংবৃত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি 'ও' উচ্চারিত হয় উচ্চ সংবৃত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি 'উ'-রূপে। যেমন—লোক > লুক, সোদপুর > সুদপুর, দোষ > দুষ।

(ঙ) সঘোষ মহাপ্রাণ বর্ণ (অর্থাৎ বর্গের চতুর্থ বর্ণ ঘ্, ধ্, ভ্) বঙ্গালীতে সঘোষ অল্পপ্রাণ (অর্থাৎ বর্গের তৃতীয় বর্ণ গ্, দ্, ব্) রূপে উচ্চারিত হয়। তাছাড়া এগুলি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী দু'টি যুক্ত হয়ে স্বরপথ রুদ্ধ করে দেয় এবং বাইরের বায়ু আকর্ষণ করে উচ্চারণ করতে হয়। এই জন্যে এগুলি রুদ্ধস্বরপথ-চালিত অন্তর্মুখী (Glottalic Ingressive) ধ্বনি। এগুলিকে কেউ-কেউ অবরুদ্ধধ্বনি (Recursive) বলেছেন। উদাহরণ—ভাই > বা'ই, ভাত > বা'ত, ঘর > গ'র।

(চ) চ্, ছ্, জ্ প্রভৃতি ঘৃষ্টধ্বনি (affricate) বঙ্গালীতে প্রায় উষ্মধ্বনি (fricative/spirant) রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—চ্ > ৎস্, ছ্ > স্, জ্ > জ্ [z]। খেয়েছে > খাইসে, জানতে পারো না > জান্তি [zanti] পারো না।

(ছ) 'স্' ও 'শ্'-স্থানে 'হ্' উচ্চারিত হয়। যেমন—শাক > হাগ, সে > হে, বসো > বহো।

(জ) শব্দের আদিতে ও মধ্যে 'হ্'-স্থানে 'অ' উচ্চারিত হয়। যেমন—হয় > অ'য়।

(ঝ) তাড়িতধ্বনি 'ড়্' কম্পিতধ্বনি 'র্'-রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—বাড়ি > বারি।

রূপতত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

(ক) কর্তৃকারকে (নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট কর্তায়) '-এ' বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন—রামে খায়। মায়ে ডাকে।

(খ) সকর্মক ক্রিয়া প্রসঙ্গে '-কি ?'—এই প্রশ্নের যে উত্তর পাওয়া যায় তাকে মুখ্য কর্ম বলে এবং 'কাকে ?—'এই প্রশ্নের যে উত্তর পাওয়া যায় তাকে গৌণ কর্ম বলে। বঙ্গালীতে গৌণ কর্মে ও সম্প্রদান কারকে '-রে' বিভক্তি

বোধ হয়। যেমন—আমারে দাও। তাদেরে কইলি। গরীব মানুষেরে দু'টি পয়সা দাও।

(গ) অধিকরণ কারকের বিভক্তি হল '-ত'। যেমন—বাড়ীত থাকুম।

(ঘ) কর্তৃকারক ছাড়া অন্য কারকে বহু বচনের বিভক্তি হল '-গো'। যেমন—আমাগো খাইতে দিবা না?

(ঙ) ক্রিয়ারূপের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল—রাঢ়ীতে যেটা সাধারণ বর্তমানের রূপ বঙ্গালীতে সেটা ঘটমান বর্তমান অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন—মায়ে ডাকে (অর্থাৎ মা ডাকছে)।

(চ) সদ্য অতীতে উত্তম পুরুষের ক্রিয়ার বিভক্তি হল '-লাম'। যেমন—আমি খাইলাম।

(ছ) রাঢ়ীতে যেটা ঘটমান বর্তমানের বিভক্তি বঙ্গালীতে সেটা পুরাঘটিত বর্তমানের বিভক্তিরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন—আমি করসি (< করছি) (অর্থাৎ আমি করেছি)।

(জ) মধ্যম পুরুষের সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের বিভক্তি হল '-বা'। যেমন—তুমি যাবা না?

(ঝ) উত্তম পুরুষের সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের বিভক্তি হল '-উম' ও '-মু'। যেমন—আমি যামু (অর্থাৎ আমি যাবো); আমি খেলুম না (অর্থাৎ আমি খেলব না)।

(ঞ) রাঢ়ীতে অতীত কালের ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত নঞর্থক অব্যয় যেখানে 'নি', বঙ্গালীতে সেখানে 'নাই'। যেমন—তুমি যাও নাই? (তুমি যাও নি?)

(ট) অসমাপিকার সাহায্যে গঠিত যৌগিক ক্রিয়ার সম্পন্নকালের মূল ক্রিয়াটি আগে বসে, অসমাপিকা ক্রিয়াটি পরে বসে। যেমন—রাম গ্যাসে গিয়া (=রাম চলে গেছে)।

বঙ্গালী উপভাষার নিদর্শন :

ঢাকা (মানিকগঞ্জ): "য়্যাক্ জনের্ দুইডী ছাওয়াল্ আছিলো। তাগো মৈদ্দে ছোটডি তার বাপেরে কৈলো, "বাবা, আমার বাগে যে বিত্ত-ব্যাসাদ্ পরে, তা আমারে দ্যাও।" তাতে তিনি তান্ বিষয়-সোম্পত্তি তাগো মৈদ্দে বাইটা দিলাান্।"[৬২]

বরেন্দ্রী উপভাষার বৈশিষ্ট্য :

উত্তরবঙ্গের উপভাষা বরেন্দ্রী ও পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা রাঢ়ীর মধ্যে পার্থক্য খুবই কম, কারণ এ দু'টি প্রথমে একটিই উপভাষা ছিল। পরে উত্তরবঙ্গের ভাষায় পূর্ববঙ্গের উপভাষা বঙ্গালীর ও বিহারের ভাষা বিহারীর প্রভাব পড়ায়, উত্তরবঙ্গের ভাষার কিছু স্বাতন্ত্র্য গড়ে উঠে এবং একটি স্বতন্ত্র উপভাষার সৃষ্টি হয়।

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

(ক) বরেন্দ্রীর স্বরধ্বনি অনেকটা রাঢ়ীরই মতো। অনুনাসিক স্বরধ্বনি রাঢ়ীর মতো বরেন্দ্রীতেও রক্ষিত আছে।

(খ) সঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি অর্থাৎ বর্গের চতুর্থ বর্ণ (যেমন—ঘ্, ঝ্, ঢ্, ধ্, ভ্) শুধু শব্দের আদিতে বজায় আছে, শব্দের মধ্য ও অন্ত্য অবস্থানে প্রায়ই অল্পপ্রাণ হয়ে গেছে (যেমন—বাঘ্ > বাগ্)।

(গ) রাঢ়ীতে সাধারণত শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত পড়ে, কিন্তু বরেন্দ্রীতে শ্বাসাঘাত অতখানি সুনির্দিষ্ট স্থানে পড়ে না।

(ঘ) বঙ্গালী উপভাষার প্রভাবে বরেন্দ্রীতে জ্ [ʤ] প্রায়ই জ্ [z]-রূপে উচ্চারিত হয়।

(ঙ) শব্দের আদিতে যেখানে 'র্' থাকার কথা নয় সেখানে 'র্'-এর আগম হয় (যেমন—আম > রাম), আবার যেখানে 'র্' থাকার কথা সেখানে 'র্' লোপ পায় (যেমন রস > অস)। ফলে 'আমের রস' উত্তরবঙ্গের উচ্চারণে দাঁড়ায় 'রামের অস'।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

(ক) বরেন্দ্রীতে অধিকরণ কারকে কখনো-কখনো '-ত' বিভক্তি দেখা যায়। যেমন—ঘরত (=ঘরে)।

(খ) সামান্য অতীতকালে উত্তম পুরুষে '-লাম' বিভক্তি যোগ হয়। যেমন—খেলাম।

বরেন্দ্রী উপভাষায় নিদর্শন :

মালদহ : "য়্যাক্ ঝোন্ মানুসের দুটা ব্যাটা আছ্লো। তার ঘোর বিচে ছোট্কা আপ্নার বাবাক্ কহ্লে, বাব ধন্-করির যে হিস্যা হামি

পামু. সে হামাক্ দে। তাৎ তাই তারঘোরকে মালমাত্তা সব ব্যাটা দিলে।"[৭০]

কামরূপী (রাজবংশী) উপভাষার বৈশিষ্ট্য ঃ

আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, কামরূপীর সঙ্গে বরেন্দ্রীর ভাষাতাত্ত্বিক সাদৃশ্য বেশী, কারণ কামরূপী হল উত্তরপূর্ব বঙ্গের উপভাষা এবং বরেন্দ্রী হল উত্তরবঙ্গের উপভাষা, সুতরাং দু'য়ের মধ্যে ভৌগোলিক নৈকট্য আছে। কিন্তু কামরূপীর সঙ্গে বরেন্দ্রীর সাদৃশ্য খুবই কম, কারণ বরেন্দ্রী মূলত রাঢ়ীর একটি বিভাগ। বরং কামরূপীর সঙ্গে সাদৃশ্য বেশী বঙ্গালীর। কামরূপী হল কামরূপের (আসামের) নিকটবর্তী বঙ্গালীরই রূপান্তর।

(ক) সঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি অর্থাৎ বর্গের চতুর্থ বর্ণ (ঘ্, ঝ্, ঢ্, ধ্, ভ্) শুধু শব্দের আদিতে বজায় আছে (যেমন—ধরিল, ভরা), মধ্য ও অন্ত্য অবস্থানে প্রায়ই পরিবর্তিত হয়ে অল্পপ্রাণ হয়ে গেছে (যেমন—সমঝা-সমঝি > সম্‌জা-সম্‌জি)।

(খ) বঙ্গালীর মতো কামরূপীতেও 'ড়্' হয়েছে 'র্' এবং 'ঢ়' হয়েছে 'র্হ্'। কিন্তু এই প্রবণতা সর্বত্র দেখা যায় না। কুচবিহারের উচ্চারণে 'ড়' অপরিবর্তিতই আছে। যেমন—বাড়ির।[৭১]

(গ) চ্ জ্, স্ / শ্ [c ɟ ʃ/s] হয়েছে যথাক্রমে ৎস্, জ্, হ্ [ts z h], কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যটি সর্বত্র দেখা যায় না। গোয়ালপাড়া-রংপুরের উচ্চারণে 'স্' রক্ষিত আছে। যেমন—সতেরো > সাতির, সমঝাবার > সমজ্ঞেবার। দিনাজপুরে 'চ্' অপরিবর্তিত। যেমন—বাচ্চা।[৭২]

(ঘ) রাঢ়ীতে যেমন সাধারণত শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত পড়ে কামরূপীতে তেমন নয়, কামরূপীতে শ্বাসাঘাত শব্দের মধ্যে এবং অন্তেও পড়ে।

(ঙ) 'ও' কখনো-কখনো 'উ' রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন-কোন্ > কুন্, তোমার > তুমার। তবে এই প্রবণতা সর্বত্র সুলভ নয়। যেমন—কোচবিহার, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি স্থানে 'কোন' উচ্চারণই প্রচলিত।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

(ক) সামান্য অতীতে উত্তমপুরুষে '-নু' এবং প্রথম পুরুষে '-ইল' বিভক্তি দেখা যায়। যেমন—দেখা করু (দেখা করলাম), কহিল (বলল), ধরিল (ধরল)।

(খ) উত্তম পুরুষের একবচনের সর্বনাম হল—'মুই', 'হাম'।

(গ) অধিকরণের বিভক্তি হল '-ত'। যেমন—পাছত, পাছৎ (পশ্চাতে)।

(ঘ) সম্বন্ধ পদের বিভক্তি হল—'-র', 'ক'। যেমন—বাপোক (বাপের), ছাগলের।

(ঙ) গৌণ কর্মের বিভক্তি হল '-ক'। যেমন—বাপক্ (=বাপকে), হামাক্ (আমাকে)।

কামরূপী (রাজবংশী) উপভাষার নিদর্শন :

কোচবিহার—"এক জনা মানুসির্ দুই কোনা বেটা আছিল্। তার মদ্দে ছোট জন উয়ার বাপোক্ কইল্, 'বা, সম্পত্তির যে হিস্যা মুই পাইম্ তাক্ মোক্ দেন।' তাতে উঁয় তার মালমাত্তা দোনো ব্যাটাক্ বাটিয়া-চিরিয়া দিল্।"[13]

ঝাড়খণ্ডী উপভাষার বৈশিষ্ট্য :[14]

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

(ক) অনুনাসিক স্বরধ্বনির বহুল ব্যবহার ঝাড়খণ্ডীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। যেমন—চাঁ, হইঁছে, উঁট, আঁটা।

(খ) 'ও'-কারের 'অ'-কার প্রবণতাও ব্যাপক। যেমন—লোক>লক, চোর>চর।

(গ) অপিনিহিত ও বিপর্যাসের ফলে শব্দের মধ্যে আগত বা বিপর্যস্ত স্বরধ্বনির ক্ষীণ উচ্চারণ থেকে যায়, তার লোপ বা অভিশ্রুতিজনিত পরিবর্তন হয় না। যেমন—সন্ধ্যা>সাঁইঝ>সাঁইঝ, কালি>কাইল>কা'ল, রাতি>রাইত>রা'ত।

(ঙ) অল্পপ্রাণ ধ্বনিকে মহাপ্রাণ উচ্চারণের প্রবণতা দেখা যায়। যেমন—দুর > ধুর, পতাকা > ফত্‌কা।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

(ক) নিমিত্তার্থে চতুর্থী বিভক্তি ব্যবহারের রীতি সংস্কৃতে ছিল। এই রীতি অনুসারে বাংলাতেও নিমিত্তার্থে ব্যবহৃত বিভক্তিকে যদি চতুর্থী বিভক্তি বলি তবে বলতে পারি এই বিভক্তি '-কে' ঝাড়খণ্ডীতে ব্যবহৃত হয়। যেমন—বেলা যে পড়ে এল জলকে (জলের নিমিত্ত = জল আনতে) চল।

রাঢ়ীতে এসব ক্ষেত্রে বিভক্তি ব্যবহৃত হয় না, অনুসর্গ (জন্যে, নিমিত্ত, হেতু) ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

(খ) নামধাতুর বহুল ব্যবহার ঝাড়খণ্ডীর আরো একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। যেমন—এবার শীতে ভারি জাড়াবে (নামধাতু 'জাড়')। 'হমর ঘরে চর সাঁদাইছিল' (সিঁধিয়েছিল)।

(গ) ক্রিয়াপদে স্বার্থিক '-ক' প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়। যেমন—যাবেক নাই ?

(ঘ) যৌগিক ক্রিয়াপদে 'আছ্' ধাতুর বদলে 'বট্' ধাতুর ব্যবহার কোথাও-কোথাও দেখা যায়। যেমন—কবি রটে।

(ঙ) সম্বন্ধপদে ও অধিকরণে শূন্যবিভক্তি অর্থাৎ বিভক্তিহীনতা দেখা যায়। যেমন—সম্বন্ধ :—'ঘাটশিলা (ঘাটশিলার) শাড়ী কুনি (কুনির) মনে নাই লাগে।' অধিকরন :—'রাইত (রাতে) ছিলি ঘাটশিলা টাইড়ে'।

(চ) অপাদানে পঞ্চমী বিভক্তির চিহ্ন হল -নু, -লে, -রু। 'মায়ের লে মাউসীর দরদ' (মায়ের চেয়ে মাসির দরদ)।

(ছ) অধিকরণের বিভক্তি হল '-কে'। আজ রাতকে ভারি জাড়াবে।

বাক্যগঠনগত বৈশিষ্ট্য :

নেতিবাচক বাক্যে নঞর্থক অব্যয় সমাপিকা ক্রিয়ার আগে বসে। যেমন—চুনটুকু কেনে নাই দিলি (চুনটুকু কেন দিলি না ?)।

ঝাড়খণ্ডী উপভাষার নিদর্শন :

মানভূম—"এক লোকের দুটা বেটা ছিল ; তাদের মাঝে ছুটু বেটা তার বাপ্‌কে বল্লেক, 'বাপ্ হে, আমাদের দৌলতের যা হিস্যা আমি পাব তা আমাকে দাও।' এতে তার বাপ আপন দৌলৎ বাখরা করে তার হিস্যা তাকে দিলেক।"[৭৫]